# আর্সেনিক ঃ এক নীরব ঘাতক

## ...একটি নৃতাত্ত্বিক পর্যালোচনা

রিজভী রেজওয়ানুল ইসলাম

*মিয়াপুর, রাজশাহী জেলার অর্ন্তগত চারঘাট থানার একটি গ্রাম। গ্রামটি থানা কমপ্লেক্স থেকে মাত্র ১ মাইল দুরে অবস্থিত। এই গ্রামের দুই দিক দিয়ে বয়ে চলেছে পদ্মা ও বড়াল এ দুইটি নদী। মিয়াপুর একটি সীমান্তবর্তী গ্রাম। মিয়াপুর গ্রামের লোকসংখ্যা খুব বেশি নয়। মাত্র ২২৮৮ জন। এই গ্রামে পরিবার সংখ্যা ৪৫৫টি। গ্রামের অধিকাংশ মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে অবস্থান করছে। তারা তাদের দিন অতিবাহিত করছে মানবেতরভাবে। অধিকাংশ লোক নিরক্ষর ও দারিদ্র্যপীড়িত। এলাকার মানুষের প্রধান পেশাই হলো কৃষি। তবে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে সীমান্তবর্তী অঞ্চল হবার কারণে এ এলাকার মানুষের পেশার ক্ষেত্রে ব্যবসাও উল্লেখ্যযোগ্য। এই গ্রামটি আজ আর্সেনিক দুষণে দুষিত।*

আর্সেনিক অতি বিষাক্ত পদার্থ। প্রাচীনকাল থেকে আত্মহত্যা বা পরিকল্পিত হত্যার জন্য মানুষ আর্সেনিক প্রয়োগ করে আসছে। যুগে যুগে আর্সেনিক প্রয়োগে হত্যা করা হয়েছে অনেক মানুষ। হত্যাই নয় আর্সেনিক মানুষের জীবন বাঁচায়। প্রাচীনকালে এই বিষাক্ত পদার্থটি মানুষের রোগ নিরাময়ের কাজেও ব্যবহৃত হতো।

পৃথিবীর অনুন্নত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ একটি। এই সমস্যাবহুল দেশটির অন্যান্য সমস্যার সাথে যুক্ত হয়েছে আর্সেনিক সমস্যা। পানিতে কিছু না কিছু পরিমান আর্সেনিক সবসময়ই থাকে। বাংলাদেশে সরকারী হিসাবানুযায়ী খাবার পানিতে আর্সেনিকের সহনীয় মাত্রা হলো প্রতি ১ লিটার পানিতে ০.০৫মিগ্রা.। পানিতে বা খাদ্যদ্রব্যে আর্সেনিক থাকলেই তা খাবার অযোগ্য হয়ে পড়েনা। একটি নির্দিষ্ট পরিমানের বেশি আর্সেনিক থাকলে সেই পানি বা খাবার খাদ্যের অযোগ্য হয়। খাবার পানিতে আর্সেনিকের সহনীয় মাত্রা হচ্ছে প্রতি লিটার পানিতে ০.০৫ মিগ্রা. এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে, পানিতে ০.০৫মিগ্রা এর বেশি থাকলে তা খাওয়ার অযোগ্য কিন্তু এর কম থাকলে তা খাবার ও রান্নার কাজে ব্যবহার করা যায়। মাটি গঠনের প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক উপাদান সাথে অতি সামান্য পরিমানে আর্সেনিক সহাবস্থান করে। মাটি গঠনের শিলার মধ্যে পাললিক শিলাস্তরে আর্সেনিকের পরিমান থাকে অনেক বেশি। প্রাকৃতিক উপায়ে বায়ু, মাটি, পলল, পানি, প্রাণী ও উদ্ভিদ কলাতে সামান্য পরিমান আর্সেনিকের উপস্থিতি আছে। পৃথিবীর বহুদেশের পানিতে প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম উপায়ে আর্সেনিক দুষ্টতার ঘটনা জানা যায়। বাংলাদেশের অধিকাংশ এলাকাই এখন আর্সেনিক বিষের কবলে। মাত্র ৩০ বছর আগেও অগভীর নলকুপ ছিলো গ্রামাঞ্চলের মানুষের জন্য এক আর্শীবাদ। আজ সেই নলকূপের পানিতেই ভয়াবহ আর্সেনিক বিষ। জেনে বা না-জেনে অনেকেই সেই বিষাক্ত পানি খেয়ে আক্রান্ত হয়ে পড়েছেন আর্সেনিক রোগে। আর্সেনিক কেবল মাত্র রোগের সৃষ্টি করছে না এটি সামাজিক জীবনেও তৈরী করছে ভয়াবহ বিপর্যয়। ভেঙ্গে যাচ্ছে ঘর - সংসার। আর্সেনিক সৃষ্টি করছে এক ভয়াবহ সামাজিক বিপর্যয়।

১৯২৮ সালের প্রথম দিকে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে ভুর্গভস্থ খাবার পানি সংগ্রহের জন্য হস্তচালিত নলকুপ বসানোর পরিকল্পনা নেয়া হয়। ১৯৭১ সালে দেশের গ্রামাঞ্চলে এ ধরনের নলকূপের সংখ্যা ছিলো প্রায় ১ লাখ ৬৮ হাজার। সে সময় গ্রামাঞ্চলের বেশিরভাগ লোক গৃহস্থালী কাজের জন্য ভুপৃষ্ঠের পানি ব্যবহার করতো। এ অবস্থায় গ্রামাঞ্চলে ডায়রিয়া ও অন্যান্য পানিবাহিত রোগ ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ভুগর্ভস্থ পানি রোগজীবানুমুক্ত হওয়ায় নলকূপের পানি ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। নলকূপের পানি এখন গ্রামাঞ্চলের ৯৮% মানুষের আওতার মধ্যে। গ্রামাঞ্চলে অগভীর নলকুপই বিশুদ্ধ পানির একমাত্র উৎস। কেবল গ্রামাঞ্চল নয়, শহরাঞ্চলের পানি সরবরাহ ব্যবস্থাও অনেকটাই ভুর্গভস্থ পানির ওপর নির্ভরশীল। ৯০ দশকের শুরুতে দেশে নলকূপের পানিতে আর্সেনিক বিষ ধরা পড়ে। সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন জরীপের মাধ্যমে দেখা গেছে যে, ৭০ লক্ষ জনসাধারণ পানিবাহিত আর্সেনিক দুষণে দুষিত। আর্সেনিক রোগের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় যে, দীর্ঘদিন ধরে আর্সেনিক যুক্ত পানি গ্রহণের মাধ্যমেই এই রোগের বিস্তার। ১৯৯৩ সালে প্রথম নলকূপের পানিতে আর্সেনিকযুক্ততা লক্ষ্য করা গেলেও ১৯৯৫ সালে এর সত্যতা ঘটে।

আর্সেনিক একটি নীরব ঘাতক। এর কোন চিকিৎসা পদ্ধতি এখনও পর্যন্ত আবিস্কার হয়নি। বিশুদ্ধ খাবার পানি পানই হলো এ রোগের বড় চিকিৎসা। আর্সেনিক এর কারণে মানবদেহে যে সকল রোগ হয়ে থাকে তাহলো- শরীরের নানা কোষ ব্যবস্থাদী ধীরে ধীরে আক্রান্ত হয় ও বিকল হতে থাকে, ত্বকের স্বাভাবিকতা হ্রাস পেতে থাকে, ক্যান্সারের ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়, রক্তের শ্বেত ও লোহিত কণিকা তৈরী হ্রাস পায় এবং হৃদযন্তের অস্বাভাবিক আচরণ প্রকাশ পায়। আর্সেনিক রোগের কারণে সৃষ্টি হচ্ছে সামাজিক সমস্যার।

আর্সেনিক ঃ

আর্সেনিক দানাদার একটি মৌল। যা ভঙ্গুর এবং ধুসর সাদা বর্ণের পদার্থ। আর্সেনিকের পারমানবিক সংখ্যা- ৩৩। আর্সেনিক প্রকৃতিতে মুক্ত অবস্থায় খুবই দ্রুস্প্রাপ্য। এটি সবসময়ই অন্য বস্তুর যৌগ হিসেবে অবস্থান করে। আর্সেনিক একটি অপধাতু। বিজ্ঞানীদের মতে, আর্সেনিকের মাঝে ধাতু এবং অধাতু গুণের মিশ্রন আছে বলে আর্সেনিক অপধাতু হিসেবে পরিচিত। পানিতে মিশানো অবস্থায় আর্সেনিকে কোন রং বা গন্ধ থাকে না। আর্সেনিক অতি সহজেই অন্য ধাতুর সাথে যুক্ত হয়ে বিভিন্ন যৌগ হিসেবে পরিবেশে থাকে। প্রকৃতিতে আর্সেনিক আগ্নেয়শিলা এবং খনিজ আকরিক এর সাথে প্রচুর পরিমানে থাকে। আর্সেনিক প্রাকৃতিক উপায়ে সৃষ্ট একটি স্বাদ ও গন্ধহীন ভঙ্গুর ধাতুকল্প। এটি অত্যন্ত বিষাক্ত পদার্থ। আর্সেনিক স্বাভাবিক অবস্থায় বায়ু, মাটি, পানি ও প্রানীদেহে অতি সামান্য পরিমানে বিদ্যমান। আমাদের দেহেও সামান্য পরিমানে আর্সেনিক আছে। আর্সেনিক দুষ্ট ভুর্গভস্থ শিলা ও মাটি থেকে ভুর্গভস্থ পানিতে ও উদ্ভিদে ছড়িয়ে খাদ্য শৃংখল দুষিত করে। মাত্রাধিক্য পরিমানে আর্সেনিক সেবন করলে চামড়া, রক্তনালী, বৃক্ক ও স্নায়ুতন্ত্রের স্বাভাবিক কাজের বিঘ্ন সৃষ্টি হয় এবং দীর্ঘদিন আর্সেনিক সেবনে অঙ্গে ক্যান্সার, স্নায়ু বিকলাংগ, দেহাঙ্গ বিকল এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে।

আর্সেনিককে বলা হয় বিষের রাজা। সংস্কৃতে বলা হয় সংখ্য এবং সবলা। আর বাংলায় একে অভিহিত করা হয় সংক বা সেঁকো বিষ। খৃষ্টপুর্ব প্রায় ৫০০ বছর আগে থেকেই আর্সেনিক বিষ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আসছে। চিকিৎসা শাস্ত্রের জনক হিপোক্রেটস রোগের চিকিৎসায় আর্সেনিকের বিষয়টি ব্যক্ত করছেন। গ্রীক শব্দ অৎংবহরশড়হ থেকে আর্সেনিক নামটি এসেছে। এর শাব্দিক অর্থ প্রবল (চড়ঃবহঃ) এরিষ্টটলও আর্সেনিক সমন্ধে ধারনা ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি একে স্যান্ডারাক নামে বর্ণনা করেছিলেন। একাদশ শতাব্দীতে আর্সেনিকের তিনটি যৌগ- শ্বেত ($As_4O$), হরিদ্রাভ ($As_2S_3$) এবং লোহিত ($As_4S_4$) চিহ্নিত হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আলবার্ট্রাস ম্যাগনাস নামে একজন বিজ্ঞানী আর্সেনিককে একটি মৌল হিসেবে চিহ্নিত করেন এবং এর ধাতু বিষয়ক মৌল বৈশিষ্ট্যসমুহ ব্যক্ত করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এটি একটি আর্ধশিক ধাতু হিসাবে পরিচিত হয়। যীশুখৃস্ট্রের জন্মের ৫০০ বছর আগে থেকেই চিকিৎসা ক্ষেত্রে আর্সেনিকের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। গৌতম বুদ্ধের সময়কালে (৫৬৩-৪৮৩ খৃঃপুঃ) ভারতবর্ষে চিকিৎসা ক্ষেত্রে (রাসা পদ্ধতি) আর্সেনিকের যৌগ অর্পিমেন্ট (হরিতালা) ও রিয়েলগার (মানাশিলা) এর বহুল ব্যবহারের কথা জানা গিয়েছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের জনক হিপোক্রেটস্ (৪৬০-৩৫৯খৃঃপুঃ) আর্সেনিককে শরীরের ক্ষত এর চিকিৎসায় ব্যবহারের জন্য অনুমোদন করেছিলেন। তাছাড়া পরবর্তীতে চর্মরোগ, যক্ষা, হাঁপানী, কৃষ্ঠ, সিফিলিস, বহুমুত্র, জ্বর, অপুষ্টি, ক্ষুধামন্দা প্রভৃতি রোগের চিকিৎসায় আর্সেনিক ব্যবহৃত হয়েছিলো। এছাড়া হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় আর্সেনিকের ব্যবহার প্রচলিত।

| রাসা পদ্ধতি (প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসা পদ্ধতি) | |
|---|---|
| হরিতালা | বিষক্রিয়া, হাপানী, কুষ্ঠ রোগ দুর করে, ভুতের ভয় তাড়ায়, ঋতুস্রাব বন্ধ করে, ক্ষুধামন্দা দুর করে। |
| মানাশিলা | লাবণ্য বৃদ্ধি, শরীরে তাপ বৃদ্ধি, মেদ্রহ্রাস, বিষক্রিয়া দুর করে। |

চিকিৎসা ক্ষেত্র ছাড়াও অতি প্রাচীনকাল থেকেই আর্সেনিক বিষ হিসাবে মানুষ হত্যার কাজে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ৫৫ খৃষ্টাব্দে রোমান সিংহাসন দখলের জন্য বিট্রানিকাসকে আর্সেনিকের সাহায্যে হত্যা করা হয়। নেপোলিয়নের মৃত্যুর সাথেও আর্সেনিক জড়িত। প্রাচীনকালে আর্সেনিক বিভিন্ন ধাতুর উপর প্রলেপ দেবার কাজে ব্যবহৃত হতো। কোনো কোনো দেশে আর্সেনিক্যাল-কপারের ব্যাপক ব্যবহার হতো।

ঐতিহাসিকদের মতে, খ্রীষ্টপুর্ব ৪ সহস্র বছর আগে প্রসাধনী দ্রব্য হিসেবে ব্যবহৃত হতো। তবে বিশেষ করে- রং, লেখাকালি ও কৃত্রিম সোনার অংলকার তৈরীর কাজে অধিক ব্যবহার হতো। আর্সেনিক যৌগ প্রধানতঃ কৃষি, বনজ এবং শিল্প কার্যক্রমে ব্যবহৃত হয়। কৃষিতে কীটনাশক, ইঁদুর জাতীয় প্রানী দমন, আগাছা দমন, পোকামাকড় দমন ও বনজ শিল্পে কাঠ সংরক্ষন, বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে কাঁচ ও কাঁচজাত দ্রব্যাদী, সিরামিক দ্রব্যাদি এবং কিছু ধাতুর (তামা, সীসা) সংকরকে শক্তিশালী করার জন্য আর্সেনিকের ব্যবহার হয়। এছাড়া পশুপাখির খাদ্যে পুষ্টি ও রোগ প্রতিরোগের জন্য ক্ষমতাবর্ধক ঔষধ হিসেবে এর ব্যবহার হয়ে থাকে। কম্পিউটার শিল্পে আর্সেনিকের ব্যবহার এখন একটি অপরিহার্য বিষয়।

প্রকৃতিতে আর্সেনিকঃ

প্রকৃতিতে আর্সেনিক ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে আছে। এই আর্সেনিক এর উপস্থিতি চিরন্ন। মাটিতে সামান্য পরিমান প্রকৃতিগত আর্সেনিক পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু বেশিরভাগই লোহা, নিকেল, সালফার ইত্যাদির সাথে যুক্ত অবস্থায় থাকে। উৎস বস্তু

থেকে আর্সেনিক সৃষ্টি হয়ে মাটির সাথে যুক্ত হয় এবং শিল্পীয় বর্জ্য বা কৃষিতে ব্যবহৃত আর্সেনিক্যাল থেকে মাটিতে আর্সেনিক বৃদ্ধি পায়। মাটিতে আর্সেনিকের স্বাভাবিক পরিমান ৫-৬ পিপিএম থাকে এবং আর্সেনিকদুষ্ট মাটিতে এর পরিমান বৃদ্ধি পায়। মাটি হলো মানুষের অতি প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক সম্পদ। স্বাভাবিক মাটি থেকে কৃষিভূমিতে আর্সেনিকের পরিমান বেশি থাকে। বিভিন্ন আক্রমন থেকে ফসলকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে কীটনাশক প্রয়োগ করা হয়। আর এই প্রয়োগকৃত কীটনাশক আর্সেনিক এর প্রধান উৎস। দুটি উৎস থেকে মাটিতে আর্সেনিক এর যুক্ততা দেখা যায়। একটি প্রাকৃতিক ভাবে আর অপরটি কৃত্রিম ভাবে। প্রাকৃতিক ভাবে মাটিতে আর্সেনিকের প্রধান উৎস হলো শিলা। এ শিলা থেকে বিভিন্ন আকরিকের মাধ্যমে মাটিতে আর্সেনিক যুক্ত হয়। প্রাথমিক শিলা রূপান্তরিত হয়ে মাটিতে পরিণত হবার সময় থেকেই আর্সেনিকের অবস্থান। এছাড়া অপর যে বিষয়টি তা হলো কৃত্রিম। আর্সেনিকযুক্ত কীটনাশক, রাসায়নিক সার, সেচ ও জীবাশ্ম জ্বালানীর ছাই, শিল্প ও প্রাণীর আর্বজনা থেকে মাটি আর্সেনিক দুষ্ট হয়ে থাকে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপ, শিল্প-কলকারখানা বৃদ্ধি ও অতিরিক্ত খাদ্য সমস্যা মেটানোর লক্ষ্যে উ"চ ফলনশীল প্রজাতির চাহিদা মেটাতে অত্যাধিক পরিমানে ভূর্গভস্থ পানি উত্তোলিত হয়ে আসছে। ফলে বিভিন্ন ভাবে পানযোগ্য পানির গুনগত মান বিঘ্নিত হ"ছে। ভূর্গভস্থ পানি হয়ে পড়েছে দুষিত। এই দুষিত হবার কারণ হিসেবে আমরা পানিতে আর্সেনিক দুষ্টতার কথা বলতে পারি। বাতাসে আর্সেনিক ধুলিকনার আকারে ত্রিযোজনী আর্সেনিক হিসেবে বিদ্যমান। গ্রামাঞ্চলে ও শহরাঞ্চলের বাতাসে আর্সেনিকের স্বাভাবিক মাত্রা- ১-১০ ন্যানোগ্রাম/কিউবিক মিটার এবং ২০ ন্যানোগ্রাম/কিউবিক মিটার। শিল্পবর্জ্য হিসাবে নির্গমন ছাড়াও বায়ুতে আর্সেনিকের মিশ্রন ঘটে সাধারণত প্রাকৃতিকভাবে বায়োমিথাইলেশন প্রক্রিয়া এবং আগ্নেয়গিরির উদগিরণ থেকে। আর্সেনিক প্রকৃতির সর্বত্র বিরাজমান বিধায় সকল শস্য-সব্জী, ফলমুল, মাংস, মাছ, দুধ ও পানীয়তে কমবেশি আর্সেনিক পাওয়া যায়। সাধারণতঃ সকল খাদ্যদ্রব্যে এর পরিমান ১মিলিগ্রাম/কেজির নিম্নে, যা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর নয়। তবে সামুদ্রিক খাদ্য যেমন মাছে আর্সেনিকের পরিমান অনেক বেশি থাকে।

আর্সেনিকের বিষক্রিয়া ঃ

বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও ঔষধসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে আর্সেনিকের কুপ্রভাব অতি প্রাচীন। আর্সেনিকের তীব্র বিষক্রিয়ার জন্য প্রাচীন কালে এটি নরহত্যায় ব্যবহৃত হতো। আর্সেনিকের বিভিন্ন বাহ্যিক অবস্থার উপর এর বিষাক্ততা নির্ভরশীল। আর্সেনিক এবং কতিপয় আর্সেনিক যৌগ ক্যান্সারের কারকরূপে প্রমানিত। আর্সেনিকের ভৌত রাসায়নিক অবস্থা এবং ডোজের পরিমান এর ওপরেই নির্ভর করে এর বিষায়ন ক্ষমতা। অজৈব যৌগরূপে আর্সেনিক জৈব যৌগসমুহের চেয়ে শতগুন বেশি দুষণ ঘটাতে সক্ষম। পানিতে দ্রবনীয় আর্সেনিক যৌগ তুলনামুলকভাবে অধিক ক্ষতিকারক। অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় মানুষের আর্সেনিকে আক্রান্ত হবার হার বেশি। একটু বেশি মাত্রায় আর্সেনিক মানুষের শরীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে সেটা মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর্সেনিকের কারণে সৃষ্ট বিষক্রিয়া প্রধানতঃ দুই ধরনের-

১. তাৎক্ষনিক আর্সেনিক বিষক্রিয়া।
২. দীর্ঘকালীন আর্সেনিক বিষক্রিয়া।

তাৎক্ষনিক আর্সেনিক বিষক্রিয়া ঃ

সাধারণত ৭০-৩০০ মিগ্রা আর্সেনিক ভুলক্রমে বা ই"ছাকৃত ভাবে খেয়ে ফেললে বা খাওয়ালে তাৎক্ষনিকভাবে যে বিষক্রিয়া হয় তাকেই তাৎক্ষনিক আর্সেনিক বিষক্রিয়া বলে। এই বিষক্রিয়ার ফলে রোগীর কিছুক্ষনের মধ্যে বমি ও পাতলা পায়খানা শুর" হয়। চিকিৎসায় বিলম্ব ঘটলে অতিরিক্ত পানি শুন্যতার জন্য রোগী অল্প সময়ের মধ্যেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে ও মৃত্যুবরণ করতে পারে।

দীর্ঘকালীন আর্সেনিক বিষক্রিয়া ঃ

পানি বা অন্য কোন মাধ্যম হতে গ্রহণযোগ্য মাত্রার চাইতে বেশি আর্সেনিক দীর্ঘকাল ধরে শরীরে প্রবেশ করলে, ধীরগতিতে দৈহিক আর্সেনিক সঞ্চয় বৃদ্ধি পায় ফলে দীর্ঘস্থায়ী বা ক্রনিক আর্সেনিক বিষক্রিয়া জনিত লক্ষন দেহে প্রকাশ পায়। দীর্ঘস্থায়ী আর্সেনিক জনিত বিষক্রিয়াকে চিকিৎসা পরিভাষায় আর্সেনিকোসিস বলা হয়। দীর্ঘস্থায়ী আর্সেনিক বিষক্রিয়ার ফলে লক্ষন পরিলক্ষিত হতে ২ থেকে ১০ বছর বা ততোধিক বছর সময় লাগতে পারে। তবে সাধারণতঃ ৪-৬ বছরের মধ্যে বেশি পরিলক্ষিত হয়। আর্সেনিক দেহের সকল অঙ্গ প্রতঙ্গে আক্রমন করতে পারে। দীর্ঘস্থায়ী আর্সেনিক বিষক্রিয়ার লক্ষণ সমুহ এত ধীরে ও দীর্ঘকাল ধরে প্রকাশ পায় যে, লক্ষণগুলো অনেক সময় রোগের মতো মনে হয়না। তাই প্রাথমিক অবস্থায় রোগ চিহ্নিত করা দুর"হ হয়ে পড়ে। আর্সেনিকোসিস রোগের প্রাথমিক লক্ষন সমুহ সাধারণতঃ চর্মে প্রকাশ পায়।

আর্সেনিকোসিস রোগের ফলে মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গে আর্সেনিকের প্রভাবে বিভিন্ন লক্ষন প্রকাশ পায়। পানির মাধ্যমে স্বল্পমাত্রায় শরীরে আর্সেনিক প্রবেশ করলে শরীরের নানা কোষ ও ব্যবস্থাদী (রক্ত সঞ্চালন, বৃক্কীয় প্রক্রিয়া) ধীরে ধীরে আক্রান্ত ও বিকল হয়। ত্বকের উপরের চাইতে নিঃশ্বাসে অথবা মুখগহবরের মাধ্যমে আর্সেনিক শরীরে প্রবেশ করলে সেটা অধিকতর

ক্ষতি করে থাকে। মুখের মাধ্যমে (খাবার পানির সাথে) আর্সেনিক শরীরে প্রবেশ করলে- ত্বকের স্বাভাবিকতা নষ্ট হয় ও ত্বকের ক্যান্সার হতে পারে, ক্যান্সারের ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়, বিশেষ করে যকৃৎ, পিত্তথলি, বৃক্ক ও ফুসফুসের। পরিপাক যন্ে প্রদাহ থেকে শুর" করে ব্যথা, বমি বমি ভাব, পেটের অসুখ ইত্যাদি হতে পারে। পুষ্টিহীনতার প্রকোপ বৃদ্ধি পায়, রক্তের শ্বেত ও লোহিত কণিকা তৈরী হ্রাস পায়। হৃদযন্ের অস্বাভাবিক আচরণ প্রকাশ পায়। রক্ত পরিবাহী নালীর ক্ষতি হয়। এছাড়া স্নায়ুতন্ের বৈকল্য এবং গর্ভাবস্থায় ভ্র"ণের ক্ষতি হতে পারে। প্রাথমিক পর্যায়ে রোগীর মুখমন্ডলে ও দেহে কালচে রক্তিমাভা প্রকাশ পায়। কালো কালো ফোঁটা শরীরে প্রকাশ পায়। একে মেলানোসিস বলে। ফোটা ফোটা কালো দাগকে বলে স্প্লটেড মেলানোসিস। এই দাগ যখন শরীরে ব্যাপক স্থান জুড়ে থাকে তখন তাকে ডিফিউজ মেলানোসিস বলে।
চর্মের সবচেয়ে চোখে পড়ার লক্ষন হ'ছে হাত ও পায়ের তালুতে ছড়িয়ে পড়া শক্ত শক্ত গোটা বা কড়া। হাত ও পায়ের তালুর এই গোটা বা কড়াকে বলা হয় কেরাটোসিস। কেরাটোসিসও স্প্লটেড ও ডিফিউজ হতে পারে। কেরাটোসিস যখন অত্যন্ বেশি আকার ধারণ করে তখন তাকে বলা হয় হাইপার কেরাটোসিস। কোন কোন ক্ষেত্রে কেরাটোসিস ক্যান্সারেও রূপ নিতে পারে। খাবার মাধ্যমে আর্সেনিক দেহে প্রবেশ করলে সাধারণত ফুসফুসে তেমন কোন প্রতিক্রিয়া করেনা। তবে দীর্ঘকালীন কাশি হতে দেখা যায়। এর ফলে রাইনাইটিস, ব্রংকাইটিস ইত্যাদি রোগ হয়। আর্সেনিকের কারণে হৃদযন্ের মাংসপেশীতে বৈকল্য ঘটতে পারে। দীর্ঘকাল স্বল্পমাত্রার আর্সেনিক সংস্পর্শের কারণে রক্তনালীর ক্ষতি হতে পারে। আক্রান্ রোগীদের পা ও হাতের আংগুলে ধীরে ধীরে রক্তের প্রবাহ কমে এক পর্যায়ে পচন ধরে যায়। আর্সেনিকোসিস রোগীদের মধ্যে প্রান্সীয় স্নায়ুতন্ের বিশেষ করে অনুভবের সমস্যা দেখা দেয়। যেমন- হাত পায়ের অবশতা, ব্যাথা, দুর্বলতা, অবসন্নতা ইত্যাদি দেখা দেয়। অজৈব আর্সেনিক মানুষের গর্ভস্থ ভ্র"ণে প্রবেশ করে। এর ফলে রোগীর গর্ভপাত, জন্মকালীন ওজন স্বল্পতা সহ বিভিন্ন ধরনের জন্মগত সমস্যা হয়ে থাকে।

সাধারণত একজন মানুষ আর্সেনিক দুষিত পানি পান করার পর ৫-১৪ বছরে তার শরীরের ত্বকে রোগ লক্ষণগুলি দেখা দিতে পারে। এক্ষেত্রে আর্সেনিকের পরিমান, ব্যক্তির শারীরিক পুষ্টিমান, অভ্যন্রীন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, দুষিত পানি পানের সময়কাল ইত্যাদির ওপর রোগলক্ষন প্রকাশের কাল নির্ভর করে। আর্সেনিক দুষণের কারণে যে সকল রোগ সমুহ হয়ে থাকে তা নিম্নরূপঃ-
মেলানোসিস ঃ এতে আক্রান্ ব্যক্তির শরীরত্বকের স্বাভাবিক রং বদলে ক্রমশঃ কালচে হয়ে যায়। প্রথমত হাত ও পায়ে এই পরিবর্তন দেখা যায় এবং পরে সমগ্র শরীরে দৃশ্যমান হয়। এই লক্ষনকে ডিফিউজ মেলানোসিস বলে। যদি ত্বকে ছোট ছোট সাদা কালো দাগ ধরে তাহলে তাকে স্প্লটেড মেলানোসিস বলে।
কেরাটোসিস ঃ হাত ও পায়ের তালু ক্রমশঃ শক্ত হয়ে যায়। সম্পূর্ন হাত ও পায়ের তালু শক্ত হয়ে যাওয়াকে ডিফিউজ কেরাটোসিস বলে। এই কেরাটোসিস এর ওপরে আঁচিলের মতো শক্ত গোটা পরিলক্ষিত হয়। ডিফিউজ কেরাটোসিস ছাড়াও এ ধরনের গোটা দেখা দিলে তাকে স্প্লটেড কেরাটোসিস বলে। ব্যাথা বা চুলকানী অনুভুত না হলেও ক্রমশঃ তালুতে ঘা হয়। এই অবস্থাকে প্রাক-ক্যান্সার হিসেবেও অভিহিত করা হয়।
গ্যাংগ্রিন ঃ আর্সেনিক বিষক্রিয়ার কারণে মানবশরীরে ক্ষুদ্র রক্তনালীতে ক্ষত সৃষ্টি হয়। এই ক্ষতের কারণে হাত- পায়ে ঘা অথবা পচন দেখা দিতে পারে। যা ক্ষেত্র বিশেষে কেটে বাদ দিতে হতে পারে।
আর্সেনিক বিষক্রিয়ার ফলে ত্বকের যে পরিবর্তন ঘটে তা সুনির্দিষ্ট নয়। প্রাথমিক পর্যায়ে রক্তে আর্সেনিক আক্রমনের লক্ষনসমুহ ধীরগতিতে প্রকাশ পেতে থাকে। কিন্তু পরবর্তীকালে শরীর, ত্বক, হাত-পায়ের তালু ও অন্যান্য স্থানে রোগের লক্ষন প্রকাশ পায়। কিন্তু পরবর্তীকালে দৃশ্যমান রোগের ক্ষেত্রে মেলানোসিস, হাইপারকেরাটোসিস উল্লেখযোগ্য। আর্সেনিক বিষক্রিয়ায় আক্রান্ রোগীদের মধ্যে কোন না কোন অঙ্গের পরিবর্তন ঘটে। দীর্ঘমেয়াদী আর্সেনিক বিষক্রিয়ার ফলে রোগীর লক্ষনসমুহ যেমন, দুর্বলতা, বদহজম, অন্যমনস্কতা, ওজন হ্রাস, চুলপড়া ইত্যাদি প্রকাশ পেতে থাকে।

## আর্সেনিক দুষণ চিত্র ঃ বাংলাদেশ

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। বিভিন্ন নদনদী জালের মতো ছড়িয়ে রয়েছে সারা বাংলাদেশে। বাংলাদেশের অধিকাংশ ভুমি পললগঠিত সমভুমি। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে হিমালয়ের পাদদেশ থেকে বিভিন্ন খনিজ বহন করে পলল স্তুপীকৃত হয়ে এ সমতলভুমি সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ দ্বীপ। পদ্মা, যমুনা, মেঘনা নদী যথাক্রমে পশ্চিম, উত্তর ও উত্তর-পুর্বদিক থেকে দেশের অভ্যন্রে প্রবেশ করে একযোগে এ সুবিশাল বদ্বীপের সৃষ্টি করেছে। হিমালয় পর্বতের শুর" থেকে আরম্ভ করলে বোঝা যাবে যে পর্বতের উত্তর দিকে পর্বতের পরিসর গঠন ও দক্ষিন দিকে জলধারায় শিলা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে সাগরগামী অবস্থায় বিভিন্ন নদী ও শাখানদীর মাধ্যমে যুগে যুগে পলল স্থাপন করে এসেছে। ভুতাত্ত্বিকগণ ভুপ্রকৃতি অনুসারে সমগ্র বাংলাদেশকে নিম্নলিখিত ৪ টি প্রধান রূপে ভাগ করেছেন

১. পার্বত্য অঞ্চল ঃ উত্তর পুর্বাংশে সিলেট বিভাগের ও দক্ষিণ পুর্বাশে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চল।
২. নদী গঠিত সমভুমি অঞ্চল ঃ পুরাতন পলল ভুমি, বরেন্দ্রভুমি, মধুপুরের গড়, সাম্প্রতিক যুগের প্লাবন ভুমি।
৩. বদ্বীপ অঞ্চলীয় সমতল ভুমি ঃ দক্ষিণ পশ্চিমাংস জুড়ে বিস্তৃত এবং পদ্মা ও তার শাখা নদী সমুহ দ্বারা বিধৌত অঞ্চল। এ অঞ্চল মুলতঃ গঙ্গা বিধৌত নবীন পলল ভুমি দ্বারা গঠিত।
৪. উপকুলবর্তী সমতল ভুমি ঃ বাংলাদেশের সমুদ্র উপকুলবর্তী অঞ্চল নিয়ে এই অঞ্চল গঠিত।

বাংলাদেশের ভুমিরূপ বিবেচনা করে দেখা যায় যে, পুরাতন পলল ভুমি এবং পার্বত্য অঞ্চল ছাড়া বাংলাদেশের বাকী অঞ্চলের ভুগর্ভস্থ পানিতে প্রাকৃতিকভাবে অতিরিক্ত আর্সেনিক দুষণ ঘটেছে। আর্সেনিকের সঞ্চয় এবং দুষণের সম্ভাব্য বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষন করে দেখা গেছে যে পলল ভুমি এলাকাতেই আর্সেনিক দুষণ ঘটেছে।

বাংলাদেশের বর্তমান আর্সেনিক দুষন প্রক্রিয়াকে সম্ভবত বিশ্বের সবচেয়ে ব্যাপক ও মারাত্মক গণদুষণের ঘটনা বলা যায়। বাংলাদেশে আর্সেনিক দুষণের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা ধারনা পোষন করেন যে, বাংলাদেশের বদ্বীপ ভুমির নিচে জমা হওয়া আর্সেনিক এসেছে হিমালয় পর্বত থেকে নদীবাহিত বিভিন্ন আকরিকের সঙ্গে। দীর্ঘদিন ধরেই আর্সেনিক যৌগ হিসেবে আর্সেনিক সালফাইড ভুর্গভস্থ পানির সঙ্গে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় ছিলো। কিন্তু ১৯৬০ এর দশকে নিবিড় সেচ ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর ভুর্গভস্থ পানির স্র নিচে নেমে যেতে থাকে। কেননা অধিক ফসল ফলানোর লক্ষ্যে উ"চফলনশীল শস্যবীজের প্রর্বতনের ফলে চাষাবাদে একদিকে যেমন সার ও কীটনাশকের প্রয়োজন ও ব্যয় বেড়েছে তেমনি বেড়েছে অত্যাধিক সেচের পানির চাহিদা। আর এ কারণে গত কয়েক দশক ধরে ভুর্গভস্থ পানি তোলা হ"ছে নির্বিচারে। আর্সেনিক বিষ অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসতে থাকে। আর্সেনিক সালফাইড অক্সিজেনের সাথে মিশে অক্সিডাইজ হয় এবং তা পানির সাথে দ্রবণ সৃষ্টি করে। বর্ষাকালে যখন ভুর্গভস্থ পানির স্র উপরে উঠে আসে মাটি থেকে তখন আর্সেনিক সালফাইডের অক্সিডাইজড যৌগ পানিতে গিয়ে মিশে। কৃষিভিত্তিক বাংলাদেশে পানি অত্যন্ গুর"ত্বপুর্ণ। ১৯৭০ সালের পুর্ব পর্যন্ গ্রামীন বাংলাদেশের মানুষজন কুপ, পুকুর, খাল বা নদ-নদী থেকে পানি পান করত এবং এসব স্থানে গবাদী পশুর বিচরণও ছিল অবাধ। তখনকার দিনে মানুষেরা এসকল উৎস থেকে পানি পান করতো বলে তাদের মধ্যে পানিবাহিত বিভিন্ন রোগসমুহ মহামারী আকারে দেখা দিতো। পরবর্তীতে ইউনিসেফ ও অন্যান্য দাতা সংস্থার আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশ সরকার বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের উদ্দেশ্যে নলকুপ স্থাপন করতে শুর" করে। এবং গ্রামীন জনসাধারণকে এ পানি ব্যবহারে উদ্ভুত করে। ৭০ ও ৮০ এর দশকে এটা ছিল একটি সাফল্যের কাহিনী। কিন্তু সেই সফলতাই এখন পরিণত হয়েছে ব্যার্থতায়। এর প্রধান কারণ ভুর্গভস্থ পানিতে আর্সেনিকের উপস্থিতি। আর দীর্ঘদিন ধরে এই উৎস থেকে পানি গ্রহনের জন্য বর্তমানে দেশের অধিকাংশ লোকই আর্সেনিক দুষণে দুষিত।

১৯৯০ সালে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের 'স্কুল অব এনভায়রনমেন্টাল ষ্টাডিজ'- এর বিশেষজ্ঞগন দৈনিক সংবাদপত্রে পশ্চিমবঙ্গের আর্সেনিক সমস্যা নিয়ে এক সাক্ষাৎকারে বলেন, যেহেতু পশ্চিমবঙ্গের পুর্ব- দক্ষিণ সীমান্তের ভুগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক দুষণ ধরা পড়েছে সেহেতু বাংলাদেশের পশ্চিম- দক্ষিন সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলোর ভুগভস্থ পানি আর্সেনিক দুষণে দুষিত হতে পারে। এরপর বাংলাদেশ সরকারের জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী বিভাগ প্রথমে চাঁপাইনবাবগঞ্জের ও পাশ্বর্বতী সীমান্ত অঞ্চলের ৩৪ টি অগভীর নলকূপের পানি সংগ্রহ করে আর্সেনিক পরীক্ষা করেন। উক্ত নলকুপ গুলোতে আর্সেনিকের মাত্রা ছিল অত্যাধিক।

১৯৯৮ সালের মাঝামাঝি সময়ে দেখা যায় দেশের ৬৪ টি জেলার মধ্যে ৫৯ টি জেলাতেই আর্সেনিকযুক্ত পানি ও রোগী রয়েছে। ৬১ টি জেলায় আর্সেনিক পরীক্ষণ শেষে দেখা যায় যে, ২,২০,০০০ লোক আর্সেনিকে আক্রান্ত এবং এর মধ্যে ৫৭% আর্সেনিক্যাল চর্মাঘাত বা অঙ্গবিকৃতি রোগ বা আর্সেনিকোসিস রোগে ভুগছে।

## মিয়াপুর ঃ আর্সেনিক দুষণের শিকার একটি গ্রাম

গ্রামীন মানুষদের মধ্যে শিক্ষার অভাব প্রকট। আর এ কারণেই তাদের মধ্যে সচেতনতার অভাব দেখা দেয়। এদেশের প্রায় ৪০% মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে অবস্থান করছে। তাদের জীবন পরিচালিত হয় অন্ন সংস্থানের লক্ষ্যে। ফলে তাদের স্বাস্থ্যগত সমস্যার দিকে লক্ষ্য করার মতো সময় তাদের থাকেনা। নিরক্ষরতাও সৃষ্টি করে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা। শিক্ষার অভাবের কারণে মানুষ বিভিন্ন কুসংস্কারে বিশ্বাসী হয়ে ওঠে। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের সামাজিক অবস্থা পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, যে কোন রোগের ক্ষেত্রে তারা অন্যকে জানাতে চায় না। তারা তাদের রোগ সমুহকে পুষে রাখে। আর এ কারণে রোগের প্রভাব পড়ে বিপরীতধর্মী। কুসংস্কারের কারণে গ্রামাঞ্চলের মানুষের মধ্যে আর্সেনিক রোগের ক্ষেত্রে ধারণা করা হয় সৃষ্টিকর্তার কারণে ও রোগীর পাপের কারণে এটি হয়েছে। ফলে সামাজিকভাবে রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে ঘৃণা করা হয়। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে আর্সেনিকে আক্রান্ত রোগীদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সচেতনতার অভাব এবং অর্থনৈতিক দুর্বলতা তাদেরকে অনেককিছু থেকেই পিছিয়ে রেখেছে। এই পিছিয়ে পড়া মানুষেরা আর্সেনিক রোগে আক্রান্ত হবার পর শুধুমাত্র শারীরিকভাবেই নয় তারা সমস্যার শিকার হচ্ছে সামাজিকভাবে। যেহেতু আর্সেনিক বিষক্রিয়ার প্রাথমিক প্রভাব বা লক্ষনগুলো শরীরের বাহ্যিক দিকে যেমন- শরীরের চামড়া, হাত- পায়ের তালুতে দৃশ্যমান হয়। তাই গ্রামের অধিকাংশ মানুষ একে চর্মরোগ বলে মনে করেন। আবার অনেকে একে এক ধরনের কুষ্ঠ রোগ বলেও ধারনা পোষন করেন। এসকল কারণে ও রোগাক্রান্ত হতভাগ্য মানুষগুলো সামাজিক ভাবে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়। গ্রামীন বাংলাদেশে আর্সেনিক রোগের কারণে সামাজিকভাবে যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হন সেগুলো- সমাজ কর্তৃক একঘরে, বিবাহ-বিচ্ছেদ, বিবাহে সমস্যার সৃষ্টি ও আক্রান্ত শিশুরা সুস্থ্য শিশুদের সাথে স্বাভাবিক ভাবে খেলতে পারে না।

আর্সেনিকের সামাজিক প্রতিক্রিয়া বিশাল ও ব্যাপক। আমাদের এই দেশের পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠী এই রোগের ভয়াবহতা সম্পর্কে এখনও সচেতন নয়। স্বাস্থ্যগত রোগগুলো ছাড়াও সামাজিকভাবে আর্সেনিক আক্রান্ত ব্যক্তি বা মহিলা অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে।

আর্সেনিক দুষণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের যেসকল এলাকাগুলোর অবস্থা ভয়াবহ তাদের মধ্যে রাজশাহী জেলার চারঘাট উপজেলার মিয়াপুর গ্রামটি অন্যতম। দারিদ্র্যতা, কর্মহীনতা, বহুবিবাহ, নারী নির্যাতন এগুলোর কোনটাই এখন মিয়াপুর গ্রামের প্রধান সমস্যা নয়। সবকিছুকে ছাপিয়ে এ অঞ্চলের মানুষের প্রধান সমস্যা এখন নলকূপের পানিতে মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক দুষন। ১৯৯০ সালে এ অঞ্চলে আর্সেনিক রোগের সন্ধান মেলে। মিয়াপুর গ্রামটি নিয়ে আলোচনায় বলা যায়- মিয়াপুর গ্রামটি বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী গ্রামগুলোর মধ্যে অন্যতম। গ্রামটি থানা কমপ্লেক্স থেকে মাত্র ১ মাইল দূরে অবস্থিত। এই গ্রামের দুই দিক দিয়ে বয়ে চলেছে পদ্মা ও বড়াল এ দুইটি নদী। এ আর্থসামাজিক পর্যালোচনায় দেখা যায় এই গ্রামের অধিকাংশ মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে অবস্থান করছে। তারা তাদের দিন অতিবাহিত করছে মানবেতরভাবে। আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের অন্যান্য গ্রামগুলোর মতোই মিয়াপুর গ্রাম। গ্রামটির ক্ষেত্রে দেখা যায় এখানকার অধিকাংশ লোকই নিরক্ষর ও দারিদ্র্যপীড়িত। এলাকার মানুষের প্রধান পেশাই হলো কৃষি। তবে সীমান্তবর্তী অঞ্চল হবার কারণে এ এলাকার মানুষের পেশার ক্ষেত্রে কৃষির পাশাপাশি ব্যবসাও উল্লেখ্যযোগ্য। এছাড়া এ গ্রামটিতে অন্যান্য পেশাজীবি মানুষও লক্ষ্য করা যায়।

সামাজিকভাবেও এ অঞ্চলের মানুষ পশ্চাৎপদ। থানা সদর থেকে এই গ্রামটির অবস্থান মাত্র ১ মাইল দুরে হলেও এখানকার আর্থসামাজিক উন্নয়ন ততোটা লক্ষ্যনীয় নয়। ধর্মীয় গোড়ামী ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন এক সমাজ এখানে প্রত্যক্ষ করা যায়। এই ধর্মীয় গোড়ামী ও কুসংস্কারাচ্ছন্নতা গ্রামের মানুষের ক্ষেত্রে সামাজিকভাবে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে। এ গ্রামটিতে গবেষণাকালে সামাজিক ভাবে যে সকল প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছে সেগুলো- আক্রান্ত ব্যক্তিকে সমাজে স্বাভাবিকভাবে চলাচল করতে বাঁধা দেয়া হচ্ছে, আক্রান্ত শিশুরা স্কুলে যেতে পারছে না, ধর্মীয় অনুষ্ঠানেও যোগদানে বাঁধা, রোগটিকে ছোঁয়াচে মনে করা, যুবক যুবতীদের বিবাহে নিষেধাজ্ঞা, বিবাহ বিচ্ছেদ ইত্যাদি।

মিয়াপুর গ্রামের জনসংখ্যা, বাংলাদেশের অন্যান্য গ্রামগুলির মতোই। এই জনবসতি গড়ে তুলেছে এক সংস্কৃতি। পরিবার কাঠামো মুলতঃ দুই ধরণের। এই পরিবারগুলো হলো- একক পরিবার ও যৌথ পরিবার। এই গ্রামের অধিকাংশই কৃষি সম্পৃক্ত পেশায় জড়িত। এছাড়াও দিনমজুর, ব্যবসা, চাকুরী করে থাকে। মিয়াপুর গ্রামটি একটি সীমান্তবর্তী গ্রাম হবার কারণে এই এলাকার অনেক মানুষই অন্যান্য পেশা'র সাথে জড়িত আছে। গ্রামের মানুষদের আর্থিক অবস্থা তেমন একটা স্বচ্ছল নয়। অর্থনৈতিক ভাবে তারা দুর্বল। অর্থনৈতিক সচ্ছলতা আনয়নের লক্ষ্যে তারা বিভিন্ন উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ করে। ঋণ নেবার ক্ষেত্রে দেখা যায় আর্সেনিক আক্রান্ত পরিবারগুলোর খুব অল্প সংখ্যকই এই ঋণ গ্রহণ করেছে। আর ঋণ নেবার উৎস হিসেবে গ্রামবাসীরা সমিতি, ব্যাংক ও এনজিও থেকে ঋণ গ্রহণ করেছে। এই ঋণ গ্রহণ করেছে পরিবারের মহিলারা। পরিবারের

মহিলারা তাদের স্বামীর ব্যবসার প্রয়োজনেই বেশি মাত্রায় ঋণ গ্রহণ করেছে। এছাড়া পরিবার ও অন্য প্রয়োজনের তাগিদেও ঋণ গ্রহন করেছে। পরিবার ও অন্য প্রয়োজনের মধ্যে- গবাদী পশু ক্রয়, সন্তানদের বিবাহ, ঘর তৈরী ইত্যাদি বিষয় জড়িত রয়েছে। দারিদ্রতা থেকে গ্রামের মানুষদের মুক্তির লক্ষ্যে এই গ্রামে গ্রামবাসীদের উদ্যোগে বিভিন্ন সমিতি গঠিত হয়েছে। এছাড়া এখানে গ্রামীন ব্যাংক, আশা, প্রশিকা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান গুলোও কাজ করে চলেছে।

এই এলাকাটির ভুত্বাত্তিক পর্যালোচনায় দেখা গেছে এই এলাকাতে আর্সেনিক দুষণের উৎস মাটি। মিয়াপুর গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে পদ্মা নদী। আর এই নদীটি দীর্ঘদিন ধরে পলির সাথে বয়ে এনেছে আর্সেনিক। এই আর্সেনিক মাটির সাথে মিশে পানিকে করে তুলেছে দুষিত। আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের অন্যান্য গ্রামগুলোর মতোই মিয়াপুর গ্রাম। গ্রামটির ক্ষেত্রে দেখা যায়, এখানকার অধিকাংশ লোকই নিরক্ষর ও দারিদ্র্যপীড়িত। নিরক্ষরতার কারণে এই এলাকার মানুষেরা আর্সেনিক এর ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতন নয়। ফলে দিনের পর দিন আর্সেনিক দুষিত পানি পানের কারণে মিয়াপুর গ্রামে আর্সেনিক দুষণের ব্যাপকতা লক্ষনীয়।

কেসষ্টাডি-১

হাওয়া বেগম,
৪৮ বছর,
মাতাঃ চাখাতুন নেছা,
পিতাঃ রাহাতুল্লা বিশ্বাস

*১৯৯৭ সালের দিকে হাওয়া বেগমের আর্সেনিক ধরা পড়ে। প্রথমে সারা শরীরে ঘামাচির মতো বের হয় পরে ধীরে ধীরে তা কালো হয়ে যায়। হাতে- পায়ে ভাসুরী ওঠে। প্রথমে তিনি গ্রাম্য হাতুড়ে ডাক্তারের কাছেই তার রোগের চিকিৎসা করান। সে তাকে এই রোগটিকে চুলকানী বলে জানায় এবং চুলকানীর ঔষধ খেতে দেয়। কিন্তু অবস্থার উন্নতি না হয়ে অবনতির দিকে এগিয়ে চলে। রোগ সম্পর্কে তার ধারনা হলো- দুষিত পানি পানের জন্য এটা হয়েছে। এছাড়া আল্লাহ্ গজব তো আছেই।*
*তার স্বামীর নাম মৃত নুর"ল আমিন সরকার। ছেলেমেয়েদের বিয়ে দেবার পর তিনি ছোট ছেলের সংগে বসবাস করেন। হাওয়া বেগমের আর্থিক উৎস তার ছেলের আয়। ছেলে বাসের সুপারভাইজার। আর্সেনিকে আক্রান্ত হবার পর পাড়া- প্রতিবেশীরা তার সংগে কথা বলতো না। সামাজিকভাবে তাদেরকে একঘরে করে রাখা হয়েছিল দীর্ঘদিন। অনেকে তাদের সাথে কথা বলতো না এই ভেবে যে, তাদের পরিবারের ওপর আল্লাহ্র গজব পড়েছে। আবার অনেকে আর্সেনিককে ছোঁয়াচে রোগ বলেও ধারনা পোষন করত। তবে বর্তমানে অবস্থার উন্নতি হয়েছে।*

আর্সেনিক রোগ একদিনেই বোঝা যায়না। এটির আক্রান্তের কারণ হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে আর্সেনিকযুক্ত পানি পানের বিষয়টি জড়িত।
আর্সেনিকে আক্রান্ত হবার পর বিভিন্ন ধরনের শারীরিক সমস্যা দেখা দেয়। এই সকল শারীরিক সমস্যার কারণে মানুষ ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে। আর্সেনিকের সাথে পুষ্টি বিষয়টিও জড়িত। কিন্তু গ্রামবাসীদের অবস্থা পর্যালোচনায় দেখা যায় পুষ্টি সমস্যা গ্রামবাসীদের প্রধান একটি সমস্যা। এর কারণ হিসেবে আমরা দারিদ্র্যতাকে চিহ্নিত করা যায়। শারীরীক অবস্থা পর্যালোচনাকালে দেখা যায়

- শরীর দুর্বল লাগে
- খেতে ই"ছা করে না
- কাজ করতে ই"ছা করেনা
- হাঁটতে গেলে পায়ের পাতা ব্যাথা করে
- রাতের বেলা শরীর কামড়ায়
- মাঝে মাঝে মাথা ঘোরে
- পেট ব্যাথা করে
- সময় সময় মাথা ব্যাথা করে
- চোখের দৃষ্টি ঝাপসা মনে হয়

কেসষ্টাডি- ২
পিঞ্জিরা বেগম

*আর্সেনিক দুষণের শিকার- ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু।*
*রাজশাহী জেলার সর্বাধিক আর্সেনিক আক্রান্ত উপজেলা চারঘাট। এই চারঘাট উপজেলার একটি গ্রাম মিয়াপুর। এই গ্রামে আর্সেনিক আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা সর্বাধিক। এই গ্রামেরই মোঃ মাসুদের স্ত্রী ছিলেন পিঞ্জিরা বেগম। দীর্ঘদিন আর্সেনিক রোগে আক্রান্ত হয়ে ২০০০ সালে মারা গেছেন। পিঞ্জিরা বেগম মারা যান ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে। বিষাক্ত আর্সেনিক তার শরীরে জন্ম দিয়েছিল ক্যান্সারের। পিঞ্জিরা বেগম যখন আর্সেনিকে আক্রান্ত হন তখন গ্রামবাসীদের অনেকেই এই রোগ সম্পর্কে ছিলো অজ্ঞ। তারা আর্সেনিক সম্পর্কে কিছুই জানতো না। পিঞ্জিরা বেগমের অবস্থা ছিল ভয়াবহ। আর্সেনিকে আক্রান্ত হবার পর সে হাঁটাচলা করতে পারতো না। পারতো না কোন কিছু খেতে। সারা শরীর ছিল ঘায়ে ভর্তি। গ্রামবাসীরা তাকে ঘৃণার চোখে দেখতো। কেউ তাকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসেনি। পিঞ্জিরার স্বামী মোঃ মাসুদ চিনিকলের শ্রমিক। সেও উদাসীন ছিল তার স্ত্রীর প্রতি। পিঞ্জিরার স্বামী মাসুদ ছিল মাদকাসক্ত। উপার্জনকৃত টাকার অধিকাংশই ব্যয় করতো নেশার পিছনে। সংসারের দিকে দৃষ্টি দিতোনা। স্বামীর উদাসীনতা ও গ্রামবাসীদের অসহযোগীতা পিঞ্জিরাকে ঠেলে দেয় মৃত্যুর দিকে। চিকিৎসা করার মতো প্রয়োজনীয় অর্থ তার কাছে ছিলনা। ছিলোনা প্রতিদিন দুবেলা দুমুঠো ভাত পাবার নিশ্চয়তা। মাঝে মাঝেই পিঞ্জিরার স্বামী তার ওপর দৈহিক নির্যাতন চালাতো। এভাবে দিনের পর দিন চিকিৎসার অভাবে পিঞ্জিরা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।*

গ্রামাঞ্চলের জনসাধারনের মধ্যে দেখা যায় যে, তাদের মধ্যে চিকিৎসা গ্রহনের প্রবণতা নেই বললেই চলে। দারিদ্রতার কারণেও অনেকে চিকিৎসা গ্রহণে অনি"ছা পোষন করেন। এছাড়া সামাজিক, ধর্মীয় ইত্যাদি বিষয়ও এর সাথে জড়িত।
আর্সেনিক আক্রান্ দের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায় বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসার পাশাপাশি তারা ঐতিহ্যিক চিকিৎসা পদ্ধতিকেও গ্রহণ করেছে। হোমিওপ্যাথিক, কবিরাজী চিকিৎসা গ্রহণ করেন।

কেসষ্টাডি- ৩
ফেরদৌসী বেগম,
*ফেরদৌসী বেগম মিয়াপুর গ্রামের একজন বাসিন্দা। তাঁর স্বামীর নাম খোরশেদ আলী। তার পরিবারের প্রধান আয়ের উৎস তাঁর স্বামীর ব্যবসা। তিনি একজন সাইকেল মেকার। নিজস্ব কোন চাষযোগ্য জমি নেই। পরিবারের সদস্য সংখ্যা মোট ৫ জন। তিনি ছাড়াও তাঁর পরিবারের তার ১ ছেলে সাহাদত ও ১ মেয়ে সজীব আর্সেনিকে আক্রান্ত। ছেলেমেয়ে দুজনেই স্কুলে লেখাপড়া করত, কিন্তু আর্সেনিকে আক্রান্ হবার পর তারা আর স্কুলে যেতে পারছে না। কারণ তার সহপাঠিরা তাদের সাথে মেশেনা এবং কথাও বলেনা। কখনো কখনো তাদের শিক্ষকরাও তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করে। রোগের প্রথম অবস্থায় শরীরে কালো দাগ দেখা দেয়। তখন তিনি একে একধরনের ছুলি বলে ধারনা করেন। পরবর্তীতে সারা শরীরে কালো কালো দাগ ছড়িয়ে পড়লে এবং হাতে- পায়ে গুটি উঠলে তিনি ডাক্তারের শরনাপন্ন হন। সে সময়েই তিনি জানতে পারেন তিনি আর্সেনিক রোগাক্রান্। সময়ের পরিক্রমায় শারীরিক ও মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েন। এ সময়ে খাদ্য গ্রহনেও তার অরূচি হয়। আর্সেনিকে আক্রান্ হবার পর হাতে-পায়ে ব্যাথা ও হাঁটা চলায় সমস্যা হয়। তিনি এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা গ্রহন করেন। আর্সেনিক ছাড়াও তিনি হৃদরোগ এ আক্রান্। আর্সেনিকে আক্রান্ হবার পর তার স্বামী রোগের চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন স্থানে নিয়ে যায়। এমনকি ভারতের ভরমপুরেও সীমান্ পাড়ি দিয়ে চিকিৎসা করাতে যান। আর্সেনিকে আক্রান্ হবার পর সবাই তাকে বলতো তার যক্ষা হয়েছে। এ সময় তিনি সামাজিকভাবে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হন। তাকে সমাজচ্যুত করা হয়। পাড়া প্রতিবেশীরাও সম্পর্ক"ছেদ করে। তার সন্তানদেরকেও সবাই দুর দুর করে তাড়িয়ে দিত।*

মিয়াপুর গ্রামের আর্সেনিক আক্রান্দের মধ্যে রোগের লক্ষণ সম্পর্কীত তথ্যের ক্ষেত্রে দেখা যায়,

- সারা শরীরে মরিচার মতো দাগ
- চামড়া খসখসে
- পানি হাত পা ভিজালে সাদা হয়
- চোখ লাল হয় ও পানি পড়ে
- গায়ে অল্প জ্বর
- ভাসুরী ওঠে

## আর্সেনিক রোগের ক্ষেত্রে ধারণা

গ্রামাঞ্চলের মানুষের মধ্যে আর্সেনিক রোগের ক্ষেত্রে ধারণা- সৃষ্টিকর্তার কারণে ও রোগীর পাপ। ফলে সামাজিকভাবে রোগে আক্রান্ ব্যাক্তিকে ঘৃণা করা হয়। মিয়াপুরও এর ব্যাতিক্রম নয়। আর্সেনিক রোগে আক্রান্ হবার পর শুধুমাত্র শারীরিকভাবেই

নয় তারা সমস্যার শিকার হ'ছে সামাজিকভাবে। যেহেতু আর্সেনিক বিষক্রিয়ার প্রাথমিক প্রভাব বা লক্ষনগুলো শরীরের বাহ্যিক দিকে যেমন- শরীরের চামড়া, হাত- পায়ের তালুতে দৃশ্যমান হয়। তাই গ্রামের অধিকাংশ মানুষ একে চর্মরোগ বলে মনে করেন। আবার অনেকে একে এক ধরনের কুষ্ঠ রোগ বলেও ধারনা পোষন করেন। রোগ সম্পর্কীত ধারণা হলো-

- রোগ আল্লাহ্'য় দিছে
- বাতাস খারাপ
- পানি খারাপ
- একধরনের ছুলি
- পাপের ফল

এই আর্সেনিক রোগের ক্ষেত্রে দেখা যায় এর স্থানীয় নাম। আর এই নাম গুলো হলো- কুদি ওঠা (ফোস্কা পড়া), গুটি হওয়া।

আর্সেনিক আক্রান্ত ব্যক্তিদের কে সামাজিকভাবে খাটো করে দেখা হয়। তাদেরকে সমাজের কোন কাজেই অংশগ্রহণ করতে দেয়া হয়না। এভাবে দিনের পর দিন তারা সামাজিকভাবে হয়ে পড়েন বিচ্ছিন্ন। আর এই বিচ্ছিন্নতাই মানুষকে করে তোলে হীনমন্য। গবেষণাকৃত এলাকায়ও এই বিষয়টি লক্ষ্য করা গেছে। আর্সেনিককে ছোঁয়াচে রোগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আর এ কারণে আক্রান্ত ব্যক্তির কাজ পেতে সমস্যা হয়েছে। আবার দেখা গেছে কাজ পেলেও কাজের পারিশ্রমিকের ক্ষেত্রে বৈষম্য। তবে লক্ষ্যনীয় বিষয় হলো পারিবারিকভাবে আর্সেনিক আক্রান্ত মানুষের অবস্থান সন্তোষজনক।

কেসষ্টাডি- ৪

তোতা মিয়া

*তোতা মিয়ার পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৪ জন। তিনি বিবাহিত। তার স্ত্রীর নাম মনোয়ারা। সন্তান রনি ও লিলি। পরিবারের সবাই আর্সেনিক রোগে আক্রান্ত। প্রায় ৫ বছর ধরে তিনি আর্সেনিক রোগে রোগাক্রান্ত। তোতা মিয়ার পেশা ব্যবসা। তিনি ফেরি করে দ্রব্যাদি বিক্রয় করেন। দ্রব্যাদির মধ্যে চুড়ি-মালা-দুল এগুলোই বেশি। এছাড়া তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের ব্যবসাও করে থাকেন। আর্সেনিকে আক্রান্ত হবার প্রথম অবস্থায় তার সারা শরীরে ঘামাচির মতো বের হয় এবং চুলকায়। সে সময় ডাক্তারের কাছ থেকে চুলকানীর ঔষধ গ্রহণ করার পর তা আরো বেড়ে যায়। রোগের বর্তমান অবস্থা খুবই খারাপ। তার সারা শরীরে ঘা এর মতো বের হয়েছে। সারা গায়ে জলবসন্তের মতো হয় এবং সেখান থেকেই ঘা হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে তোতা মিয়া ক্যান্সারে আক্রান্ত। ডাক্তার বিশ্রাম নিতে বলেছে কিন্তু পরিবারের আয়ের উৎস আমি ছাড়া আর কেউ নেই। সংসারে আয় রোজগার করবার মতো আর কেউ নেই। তাছাড়া ছেলেমেয়েও ছোট। তাই তাদের দিকে তাকিয়ে নিজের বিশ্রামের কথা চিন্তা করিনা। সারা শরীরের ঘা এর মতো বের হয়েছে। আগের মতো পরিশ্রমও করতে পারিনা। আর্সেনিকে আক্রান্ত হবার পর মনে হয় বয়স যেন আগের চাইতে অনেক বেড়ে গেছে। অভাবের সংসার তাই ভালো মন্দ খাবার কথা চিন্তা করিনা। সংসারের খরচ, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া এগুলোই চালাতে পারিনা। আবার ভালো খাবার। তাছাড়া আল্লাহ্ যতদিন রাখছে ততদিনই তো বাঁচবো। তাই সবকিছু তার উপরেই ছেড়ে দিয়েছি। আর্সেনিক রোগে আক্রান্ত হবার পর সামাজিকভাবে আমাকে একঘরে করে রাখা হয়। সমাজের লোকেরা আমাকে ও আমার পরিবারকে মনে করতো আল্লাহ্ অভিশাপ দিয়েছে। তাই এ রোগের জন্ম হয়েছে। ব্যবসার ক্ষেত্রে দেখা যেত কেউ আমার কাছ থেকে দ্রব্যাদি ক্রয় করতো না। আবার অনেক সময় দ্রব্যাদি নিলেও দ্রব্যের দাম কম দিত।*

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে একটি। এদেশের শতকরা ৮০ ভাগ মানুষই গ্রামে বাস করে। গ্রামের অধিকাংশ মানুষই নিরক্ষর। গ্রামীণ মানুষের জীবনচক্র তথা জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত নানা ধরনের কুসংস্কারে আবদ্ধ। এ সকল কুসংস্কার তারা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মেনে চলে। মুল্যবোধ ও প্রথা-প্রতিষ্ঠানগত বিষয়াদি ব্যক্তির স্বাস্থ্য ও ব্যাধির জৈবিক অবস্থাকে প্রভাবিত করে। গ্রামাঞ্চলের মানুষ আবহমান কাল থেকেই বিভিন্ন কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসে আচ্ছন্ন। এখনও এদেশের মানুষ ভুত, প্রেত, খারাপ বাতাস, ঝাড়-ফুক, যাদু-টোনা ইত্যাদি বিশ্বাস করে। আবার নিরক্ষরতার ও বিভ্রান্তিজনিত কারণেও সৃষ্টি হ'ছে সামাজিক সমস্যা।

আর্সেনিক আক্রান্ত ব্যক্তি পরিবার এবং সমাজের অংশ। কিন্তু দুভার্গ্যজনক হলেও সত্য যে, সমাজে অনেক আর্সেনিক আক্রান্ত রোগীই অস্পৃশ্য বলে বিবেচিত হন। তাদেরকে সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়। সমাজে তাদেরকে কোন ধরনের সম্মান বা মর্যাদা প্রদান করা হয় না। গ্রামীন সমাজ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বাংলাদেশের অধিকাংশ গ্রামেই ধর্মান্ধতা বিষয়টি জড়িত রয়েছে। আমার গবেষণাকৃত এলাকায় আর্সেনিক রোগের ক্ষেত্রে সৃষ্টিকর্তাকে জড়িত করা হয়েছে। গ্রামীন সমাজে একজনের আর্সেনিক হলে বলা হয়ে থাকে এটা তার পাপের ফল। তবে সবচেয়ে বেশি যে বিষয়টি পরিলক্ষিত হয় সেটি হলো-

রোগ আল্লাহর দেয়া তাই হয়েছে। এর কারণে গ্রামীন সমাজ ব্যবস্থায়ও এর প্রভাব পড়েছে। তারা মনে করে যেহেতু এটা পাপের ফল তাই আর্সেনিক আক্রান্ত রোগীর সাথে কথা বলা যাবেনা। আর্সেনিক রোগের ক্ষেত্রে দেখা গেছে গ্রামের অধিকাংশ মানুষই মনে করেন এটা একটি ছোঁয়াচে রোগ। তাই আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে মেশা যাবেনা। গ্রামীন সমাজগুলোতে উপরোক্ত কারণেই আর্সেনিক আক্রান্ত ব্যক্তিদেরকে একঘরে করে রাখা হয়েছে।

নিরক্ষরতা মানুষকে করে তোলে কুসংস্কারা"ছন্ন। সামাজিক অবস্থা পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মিয়াপুর গ্রামের মানুষের মধ্যে আর্সেনিক রোগের ক্ষেত্রে ধারণা- সৃষ্টিকর্তার কারণে ও এটা একধরনের চর্মরোগ (ছুলি), এছাড়াও তারা অন্যান্য বিষয়গুলোকেও এক্ষেত্রে প্রাধান্য দিয়েছে। তাদের মধ্যেকার রোগ সম্পর্কীত ধারণা হলো- রোগ আল্লাহ্'য় দিছে, বাতাস খারাপ, পানি খারাপ, এটা একধরনের ছুলি, পাপের ফল। সামাজিকভাবে রোগে আক্রান্ত ব্যাক্তিকে ঘৃণা করা হয়। আর্সেনিক রোগে আক্রান্ত হবার পর শুধুমাত্র শারীরিকভাবেই নয় তারা সমস্যার শিকার হ"ছ সামাজিকভাবে। যেহেতু আর্সেনিক বিষক্রিয়ার প্রাথমিক প্রভাব বা লক্ষনগুলো শরীরের বাহ্যিক দিকে যেমন- শরীরের চামড়া, হাত- পায়ের তালুতে দৃশ্যমান হয়। তাই গ্রামের অধিকাংশ মানুষ একে চর্মরোগ বলে মনে করেন। আবার অনেকে একে এক ধরনের কুষ্ঠ রোগ বলেও ধারনা পোষন করেন। এসকল কারণেও রোগাক্রান্ত হতভাগ্য মানুষগুলো সামাজিকভাবে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়। আর আর্সেনিকে আক্রান্ত মানুষেরা হয়ে পড়েন সমাজ থেকে বি"ছন্ন। আর্সেনিক রোগের কারণে সমাজগুলোতে দেখা গেছে যে, আক্রান্ত ব্যক্তির কাজ যোগাড়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হয়। আবার কাজ পেলেও তারা কাজের সঠিক মুল্য পায়না। আর্সেনিক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি বিভিন্ন ধরনের শারীরিক সমস্যায় আক্রান্ত হয়ে থাকেন। দীর্ঘস্থায়ী আর্সেনিক বিষক্রিয়ার কারণে একজন ব্যক্তির ত্বক কালো হয়ে যায়। শরীরে অস্বাভাবিক পরিবর্তন হয়। আর্সেনিক দুষণ গ্রামীন জনপদে পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বড় ধরনের সংকট তৈরী করছে। তর"ণী বয়সে আক্রান্ত হলে মেয়েদের বিয়ে দেয়া মুশকিল হয়ে পড়ছে। বিবাহিত মহিলাদের ক্ষেত্রে তালাক প্রাপ্তি ও বাবার বাড়িতে পাঠিয়ে দেবার মতো ঘটনা। তবে এক্ষেত্রে যে বিষয়টি উল্লেখযোগ্য তা হলো মেয়েদের ক্ষেত্রেই এ বিষয়টি ব্যাপকভাবে প্রভাব ফেলেছে। আর্সেনিক আক্রান্ত রোগীকে কুষ্ঠ বা অন্য কোন ছোয়াঁচে রোগাক্রান্ত হিসেবে চিহ্নিত করা হ"ছ। ফলে আক্রান্ত ব্যক্তিকে সমাজে স্বাভাবিকভাবে চলাচল করতে দেয়া হয়না। আক্রান্ত শিশুদের স্কুলে আসতে মানা করা হয়। বয়স্ক ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে তাদেরকে ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগদান করতে দেয়া হয়না। আবার প্রতিবেশীদের নলকূপ থেকে পানি আনতেও বারণ করা হয়। যুবক-যুবতীদের বিবাহ করতে দেয়া হয়না। এভাবে ধীরে ধীরে সমাজ কর্তৃক আর্সেনিক আক্রান্ত রোগীদের ভিন্ন চোখে দেখা হয়।

কোন একটি বিষয়ের প্রতি সচেতনতাই সেই বিষয়টিকে কার্যকরী করে তুলতে সহায়তা করে। আর্সেনিকও তেমনি একটি বিষয়। সামজিক সচেতনতার ক্ষেত্রে প্রধান ভুমিকা রাখে শিক্ষা। শিক্ষার মাধ্যমেই সৃষ্টি হয় সচেতনতার। আর্সেনিক বিষয়ে গ্রামীন জনগোষ্ঠী সচেতন নয়। তাদের এই রোগের ক্ষেত্রেও ধারনা খুবই কম। আর্সেনিক সমস্যা থেকে রক্ষার একমাত্র উপায় হলো আর্সেনিক দুষ্ট পানি না পান করা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে আর্সেনিকের শিকার হয়েছে গ্রামের দরিদ্র জনগন। আর্সেনিক আক্রান্ত রোগীর পরিশ্রম করার ক্ষমতা হ্রাস পায়। দরিদ্র জনগন কায়িক পরিশ্রম করতে না পারলে তাদের পক্ষে খাদ্য সংস্থান করা একেবারেই অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফলে তাদের দেহে ক্রমে অপুষ্টি সমস্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং এর সাথে সাথে আর্সেনিক আক্রমনের তীব্রতাও বাড়তে থাকে। তাই আর্সেনিক সমস্যা দুরীকরনের জন্য সামাজিক সচেতনতার প্রয়োজন রয়েছে।

দারিদ্রতা এই এলাকার মানুষকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে। আর্সেনিক আক্রান্ত রোগীর পরিশ্রম করার ক্ষমতা হ্রাস পায়। দরিদ্র জনগন কায়িক পরিশ্রম করতে না পারলে তাদের পক্ষে খাদ্য সংস্থান করা একেবারেই অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফলে তাদের দেহে ক্রমে অপুষ্টি সমস্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং এর সাথে সাথে আর্সেনিক আক্রমনের তীব্রতাও বাড়তে থাকে।

আর্সেনিক আক্রান্ত ব্যক্তি পরিবার এবং সমাজের অংশ। কিন্তু সমাজে অনেক আর্সেনিক আক্রান্ত রোগীই অস্পৃশ্য বলে বিবেচিত হন। তাদেরকে সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়। সমাজে তাদেরকে কোন ধরনের সম্মান বা মর্যাদা প্রদান করা হয় না। মিয়াপুর গ্রামটি পর্যালোচনায় দেখা যায় দিনের পর দিন এগ্রামটিতে আর্সেনিক দুষনের ব্যাপকতা বেড়েই চলেছে। আর্সেনিক আক্রান্ত রোগীরা হয়ে পড়ছে সমাজ থেকে পশ্চাৎপদ। শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত এ রোগের শিকার। পর্যাপ্ত স্বাস্থসেবার মান এখানে খুব নিচে। দিনের পর দিন আর্সেনিক শিকার হয়ে এ গ্রামের মানুষ মৃত্যুর কাছাকাছি এগিয়ে চলেছে। কিন্তু তারপরেও তারা থেমে নেই। সুন্দর ভাবে এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে গ্রামবাসীরা সবাই মিলে আর্সেনিকের বির"দ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছে। স্বপ্ন দেখছে সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার। এই সুন্দর পৃথিবীতে তার স্বপ্নের বাস্বায়নের জন্য।